সূচীপত্র

তোমাকে ভুলতে পারি না

কতোদিন আমি দেখিনি তোমার মুখ
কতোদিন আমি চাইনি তোমার চোখে
কতো রাত্রির কান্নায়-ফাটা বুক
আবার ডেকেছে সকালের স্বপ্নকে।

আবার এসেছে রমনার মাঠে পলাশ রঙের দিন
চিত্রকরের তুলিতে রঙিন শহর
নীলক্ষেত জুড়ে পাতায় পাতায় স্বপ্নের আশ্বিন
সাদা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত শীতল রাত্রির প্রান্তর।

মাটির গন্ধে আকুল আকাশ, রক্ত-জমাট ধুলো
কৃষ্ণচূড়ায় পলাশে শিমূলে উত্তাল মর্মর
ভীষণ আশার বারুদের মতো দিনগুলো জ্বলেছিল
আগুনে পুড়েছে চৈত্র, তুলেছে কালবৈশাখী ঝড।

ঝড়ের দোলায় দুর্বার দিন, শহীদ বেদীতে মাল্য
ঘরে ঘরে নদী জোয়ারের কল্লোল
বাংলার ক্লাসে শহীদ-স্মরণ অম্লান শিখা জ্বাল্‌ল
ঘরে ঘরে নদী জোয়ারেই উচ্ছল।

কী করে ভুলব, তোমাকে ভুলতে পারি না
তোমার মুখের মমতা আমার শান্তি
রৌদ্রের দিন স্মৃতি-অর্কিডে ভরেছে আমার আঙিনা
তোমার মুখের মমতা আমার শান্তি
আমাকে করেছে উন্মাদ, আমি কিছুতে ভুলতে পারি না
তোমার চোখের দৃষ্টি আমার শান্তি।

যে যার আপন ঘরে

যে যার আপন ঘরে ফিরে যেতে চায়
ফিরে যেতে চায় গৃহ পল্লবের কাছে
পরবাসী, ঘুরে ঘুরে ভাসানো নৌকায়
ভোরের গলুই বাঁধো তীরবর্তী গাছে।

কয়েকটি পায়ের দাগ নোনাগন্ধ তীরে
আঙুল দেখানো দূর মুখ দেখে জলে
শব্দের সবল বৈঠা টেনে নেয় দূরে
শুশুকের দীর্ঘশ্বাস লাগে না মাস্তুলে।

ঘরের উঠোনে ছায়া, বৃক্ষ সারি বাঁধা
গৃহমণি ছিন্নমূল, দুস্তর পরিধি
মাটিতে ছড়ানো ছেঁড়া জলধোয়া পাতা
নষ্ট ফুল, শ্যাওলা, দাগ আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি

শিশুর দুরন্তপনা খেলা করে মাঠে
পার্কের পেনসন-বুড়ো ঠাণ্ডা লাগা ভয়
ঘুমের কাতর রাত্রে খিল-দেওয়া কপাটে
অন্ধকারে আলোড়িত বিপন্ন সময়।

কাকে ডাকব উঠোনের একদিকে দাঁড়িয়ে
আমার গলার স্বর ভেঙে যেতে চায়
আমার গলার স্বর যদি ভেঙে যায়
সময় বাউল তুমি একতারা বাজাও।

সহজ হওয়ার শব্দ সবচেয়ে কঠিন
খুঁজি যতো হৃদয়ের আন্তরিক ধ্বনি
প্রান্তরে, পাহাড়ে, বনে কোথায় সে-নিষ্পাপ হরিণ
খুঁজি দূরে, খুঁজি কাছে, খুঁজি সারাদিনই।

যে আছো ঘরে কি বাইরে, আন্তরিক থেকো
সহজ শব্দের কণ্ঠ রোধ করে ভয়
একা বা অনেকে মিলে শবাধার ঢেকো
শীতল পাথরে বন্ধ হয়ো না সময়।

ইষ্টিকুটুম

পরস্তাবের দেশে অনেক কুটুম পাখি থাকে
সমস্ত দিন ইষ্টিকুটুম ইষ্টিকুটুম ডাকে
ঘুঘুসই-এর গান থেমে যায় যখন
ঘুমের মাসী চক্ষু পেতে বসে।

পানের বাটা পান সুপারি
বন্ধুর মুখ ভুলতে পারি
বৃষ্টি নামে ঘৃতকুমারী বনে
একলা মাঠে দিন কুড়িয়ে
পটের চোখে রাত ফুরিয়ে
ঘরের কোণে লক্ষ্মীপিদিম জ্বলে
জ্বলে জ্বলে জ্বলেই গেল
কেউ এলো না, কেউ এলো না
ইষ্টিকুটুম, ইষ্টিকুটুম।

রূপোর বাটি সোনার বাটি
লক্ষ্মীর পা উঠোন জুড়ে
ধানের দুধে ভেজা মাটি
ঘণ্টা বাজে দূরে দূরে।

হাতীর গলায় ঘণ্টা বাজে, ঘণ্টা বাজে
রাত্রিদিন বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি
ঘৃতকুমারী বনটা ভেজে বনটা ভেজে
রাত্রিদিন বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি।

জাল বুনতে কাল গেল রে
নদীর জলের আয়না
কোনখানে যে মায়ার মাছ
চোখের জালে পায় না।

মেলার বাঁশী মিলিয়ে গেল
তারার হাতে লণ্ঠন
নদীর জল অন্ধকারে ডোবে
দূরে দূরে অনেক দূরে মিলিয়ে গেল
হাতীর গলার ঘণ্টা।

নীল ঘুড়ি

পড়ি মরি করে তিনলাফ একছুট
স্নেহকে পাঠায় বুড়ী
কে পারে কে পারে সুতোটা ধরতে
নিমগাছে নীল ঘুড়ি।

সারা পাড়া, সারা সকাল দুপায়ে চষা
কোন্ বন থেকে উড়ে এলো দুটো টিয়া
ভাবে অদ্ভুত, নির্জন সেই বনটার এ কী দশা
নতুন বাড়ির ইঁট গাঁথে লাল মিঞা।

এক দণ্ডও সুস্থির নেই, পায়ের তলায় সরষে
পাখিটা বলল—উড়ি
যেখানে আকাশ তারার চুমকি বোনে
লাল মেঘে নীল ঘুড়ি।

রাত্রিদিন

সাদা পালের নৌকোগুলো কোথায় গেল ভেসে
বুকের মধ্যে আখার আগুন রাত্রিদিন জ্বলে
মানুষময় গঞ্জ ঘাট, মানুষ খুঁজি দেশে
বুকের মধ্যে আখার আগুন রাত্রিদিন জ্বলে।

নৌকা বাই, বাদায় যাই, কুড়ুল মারি গাছে
গহন গাঙে জোয়ার ভাটা বয়
বাদার ধান ফলনে ভালো, বাঘের পেটে মধুর চাক
কোথায় যাই, কোথায় যাই, কোথায় যাই ভয়।

লাউ-এর ডগা হেন গড়ন, কালো চুলের ফণ
সেই কন্যা এসেছিল পরাণহাট থেকে
পেয়ারা গাছে বসেছিল তিনটে চন্দনা
গরমভাতে ঘি-এর চাঁছি ঝাললঙ্কা মেখে।

আজকে খরা, কালকে বান, পরশু মহামারী
আখার ছাই আখার মধ্যে থাকে
বুকের উপর চেপে বসে ভীষণ পাথরই
ভাতের থালা রাত্রিদিন উপুড় করে রাখে।

সাদা পালের নৌকোগুলো কোথায় গেল ভেসে
বুকের মধ্যে রাত্রিদিন আখার আগুন জ্বলে
মানুষময় গঞ্জ ঘাট, মানুষ খুঁজি দেশে
বুকের মধ্যে রাত্রিদিন আখার আগুন জ্বলে।

কেউ এখানে

ক'ঘর আছি আমরা এই গাঁয়ে
দু'হাত দূরে শীতল ইছামতী
গঞ্জ হাট শহর পায়ে পায়ে
কেউ এখানে অহল্যা কেউ বা সুরপতি।

কেউ এখানে পরাণ মাঝি, নবীন হলধর
হৃদয়পুর অনেকদূর ধান নষ্ট খরায়
বুকের মধ্যে জেগে ওঠে ইছামতীর চর
নলরাজার উপাখ্যান, যাত্রাগান পাড়ায়।

রাজারহাটে বিক্রি বাটা মহাজনের আড়ত
সওদা কিনে সওদা হয় ভালোবাসার জন
ভাঙন নদী পাড় ভাঙছে, ক্ষেতখামার জোত
ঘাট বদল, হাট বদল, নদীর গর্জন।

জ্বলন আছে বলন আছে আবার আছে মিলও
বন্যা এলে, বর্গী এলে তখন সব এক
ভালোবাসার টগর ফুল যেদিন হাতে দিল
ঝড়ের রাতে চতুর্দিকে সমুদ্রের ডাক।

ক'ঘর আছি আমরা এই গাঁয়ে
দু' হাত দূরে শীতল ইছামতী
গঞ্জ হাট শহর পায়ে পায়ে
কেউ এখানে অহল্যা কেউ বা সুরপতি।

সাদা মনে হলে কয়লাকে

মতিগতি দেখে ভয় লাগে
কি জানি কি হয় কি হয়
সাদা মনে হলে কয়লাকে
হৃদয় জ্বলবে হৃদয়।

যদি কিছু হয় আহারে
অঙ্গার হবে আঙিনা
মাথা কুটে কুটে পাহাড়ে
গুঁড়ো গুঁড়ো হবে হাওয়ারা

কিছুতেই যেন হয় না
মাটি ঘিরে থাক নদীকে
সাত সকালের ময়না
কথা বলে যেন প্রতীকে

উড়ে আসে যেন এক ঝাঁক
সাদা ধবধবে পায়রা
জলপাই পাতা মুখে থাক
অমল ধবল পায়রার।

শূন্য ভরে

ঘরবাড়ি সকলই শূন্য, বাসিন্দারা অলস শামুক
ঘুরে ফিরে শেওলা খায়, এ-পাথরে পা রাখা মুশকিল
অবস্থা ফতুর। ভয়: শূন্যতার জলবিম্ব মুখ
চুরমার বাতির কাঁচ, টিপ-করা প্রত্যেকটা ঢিল।
নয়ানজুলিতে জল নেই। হাওদায় মাহুত নেই
সহিসকে পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে ঘোড়া লম্বা ছুট
কয়েদখানায় পিঠমোড়া বাঁধা সব শয়তানরা কই।
রাত টপকে পালিয়েছে। অন্ধকার এখন ঘুটঘুট।

নুয়ে আসে সব জোর পর পর সাংঘাতিক ভারে
বাতাস কখনো বন্ধ আবার কখনো মৃদু বয়
পাথর সরাতে পারলে হয়তো জল পাওয়া যেতে পারে
নানারূপ কথাবার্তা পথঘাট অন্ধকার রাত্রির বিষয়।
পালটায় ঘাসের রঙ দুদিনে বৃষ্টিতে শোভা বাড়ে
যে-যার বাড়িতে এলে শূন্য ভরে সকল সময়।

তবু চাই

আজকাল কোথায় বা সেরকম ভীষণ বন্ধুতা
চতুর্দিকে সুদক্ষ চতুর ; কথোপকথনে খুবই পারঙ্গম, সচেতন
নানারূপ জাগ্রত বিষয়ে। নিখুঁত বানানো সব। এবং প্রতিভা আছে
তা না হলে এতো ব্যাপ্ত আয়োজন কিছুতেই সম্ভব হত না
সম্ভব হত না এই নীল শূন্যতার শোরগোল বাহবা তারিফ।
হয়তো বন্ধুরা বেশীদিন এক জায়গায় থাকলে বৈরী হয়।
হয়তো বন্ধুরা যে যার আপন ঘরে ভয়ানক নিয়ম মাফিক
আসলে বিপদ নেই এরকম দুঃসাহসী কাজে, উচ্চাশায় মই বাঁধে।
তবুও তো চাই : রাস্তা ঘুরে এরকম দু'একটা বাড়ি থাকবে তো
যেখানে যখন খুশি যাওয়া যায়, ধুলো পায়ে জলে ভিজে দাড়ি না কামিয়ে
ঘুরে ঘুরে চিরদিন যেখানে খোলাই দরজা, যেখানে অন্তত
হাওয়ায় শুকোবে ঘাম, জলে তৃষ্ণা, জুড়োবে রোদের জ্বালা
তা না হলে দিনরাত এই সব সার্কাসে দড়ির খেলা দেখে
মাঝে মাঝে শোনা যাবে নিরুপায় রাগী রুগ্ন বাঘের গর্জন।

সন্ধানের দিকে হাঁটা

আশ্বিনের তুলো মেঘ সে-কোন্ ধুনকর ধুনবে
বানাবে নিপুণ হাতে শীতের উত্তাপ-ঢাকা
কোন কৃষকের হাত নিজের দখলী মাঠে ধান বুনবে
বানাবে রোদ্দুর কেটে প্রকৃতির আশ্চর্য আঙরাখা।
জলমাটি সে-হাতে আকার পেয়ে বিচ্ছুরিত হয়
চাষী বৌ দীঘি থেকে শাপলাফুল তুলে আনে যদি
তবে এক প্রবাহিত সঙ্গীতের শিল্পের বিষয়
তুফানের উদ্দামতা আলোড়িত করে সব নদী।

দূরত্ব জয়ের দিকে সেই এক অভিযাত্রী দল
চেতনাতীর্থের দিকে একযাত্রা বহুজন মিলে
ভ্রান্তির দুর্গম বাঁকে মাঝে মাঝে ধ্বস আর ঢল
তবু পথ সন্ধানের দিকে হাঁটা একসঙ্গে সকলে।
নিসর্গে অমল আস্থা, আর আস্থা সঙ্গী বহুজনে
চেতনায় বোধে অগ্নি, অস্থিরতা প্রত্যেক সোপানে।

কার্ল মার্কস : দেড়শ' বছর হল

অন্য এক অর্থে সব আলোকিত, স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক
বহুদূর দেখা যায় চেতনার চোখ মেলে দিলে
চোখের চাউনির নীচে নীল জল
অতীত ও বর্তমান রৌদ্রের মিছিলে
রঙ্গমঞ্চ নাটকের নায়ক বদলায়।

সময়ে সংসারে থাকা। দূরে একা অথবা অনেকে
মানুষে মানুষে সেই আদিম আত্মীয় জোট
তারপর ভাগ ভাগ হয়ে
ফের মিলে
দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়া।
জয়ে, পরাজয়ে জয়ে।
রোগভোগ সাময়িক
শেষে এক আরোগ্য জড়াবে
এই আশা।

দেড়শ' মোমবাতি যেন প্রতীক স্বরূপ
দশদিক আলোকিত করে
কেননা অনেক নদী মিশে গেছে এখন সমুদ্রে
যদিও পাথরবন্দী জলধারা আছে, সচেষ্ট সর্বদা
এবং সকল নদী একদিন পথ করে সমুদ্রে যাবেই।

তুমি চিরায়ত বিভা
বিশ্বরূপ তুমিই দেখালে।

লেনিন

তুমি প্রত্যহ তুমি প্রতিদিন তুমি প্রত্যেক দিন
জনসমুদ্রে রৌদ্রে দাঁড়াও অনিবার্যকে ডাকো
মানবিক দূর উচ্চতা ছোঁয় আবেগ হৃদয় আকাশ
তুমি প্রত্যহ, তুমি প্রতিদিন তুমি চিরদিন লেনিন।

জন্ম এবং পুনর্জন্ম, জন্ম
বৃষ্টি বাতাস চিন্তা চারণভূমি
কালের আকাশ কালের শস্য
কালের কৃষক তুমি।

বজ্রে ও ফুলে জ্বেলেছো মিলনজ্যোতি
চেতনা দিয়েছে উত্তাপ আলো দৃষ্টি
মাটি ঘিরে ভালবাসার স্বচ্ছ নদী
মরুভূমিতেই যেন-বা সুফলা বৃষ্টি।

মূল ধরে তুমি নাড়া দিয়ে ডাকো জীবন
দ্বিধা-সংশয় বিদ্ধ কেন এ অসংগতির ভার
মুঠিতে আমার জাদু হাত রাখো লেনিন
প্রত্যহ তুমি, প্রতিদিন তুমি প্রতিদিন বারবার।

ইতিহাসের বাসা

আকাশের অনেক উঁচুতে হীরার মতো উজ্জ্বল
একটা তারা ফুটেছিল
এমন তারা রাত্রির আকাশে কেউ কখনো দেখেনি।

জেগে উঠে বসে
বাইরে বেরিয়ে এলো
জ্যোতির্বিদ, পণ্ডিত, পুরোহিত
আর অনেক ক্রীতদাস
আর অনেক ক্রীতদাসী।

হেরডের কপালে তখন ভয়ের রেখাগুলো
কেটে বসে গেছে।

দোলনার শিশুকে মারো গলা টিপে।

সেই তারার দিকে চোখ রেখে
যাত্রা
সেই থেকে শুরু।

শিশুহন্তাদের হাত থেকে শিশুকে রক্ষার জন্য
শিশুর উদ্যান রচনার জন্য
জীবন পণ
সেই থেকে শুরু।

পৃথিবীর একটা জায়গায়, ইতিহাসের একটা সময়ে
রক্তে ডুবিয়ে একটা নিশান পোঁতা হল।

ইতিহাসের রাস্তায় অনেক ঘোরানো সিঁড়ি, অনেক বাঁক
আর পা বদল
এক হাঁটু ক্লান্তি
এক বুক তৃষ্ণা
আর উদ্বেলিত সমুদ্র

মাঝে মাঝে অন্ধকার
বেরাস্তায় ঘুরে ঘুরে অথবা ঘুর পথে
নিঃসঙ্গতা, বিষাদ। শীতল সময় পেরিয়ে
গ্রীষ্মের তাপের মধ্যে বরফ-গলা দিন
আবার আসে।
আবার শুরু
নির্মাণ ভেঙে আবার নির্মাণ।

ঘোড়াগুলো

প্রত্নগুহার প্রাচীন শীতল উদরের অন্ধকার থেকে
পায়ে পায়ে অন্ধকার উড়িয়ে
ঘোড়াগুলো ছুটে এলো।
লম্বা লাল কালো মিশ্রবর্ণের ঘোড়াগুলো
প্রভুভক্ত, বেগবান, হিংস্র ও মরিয়া।

দেহভূমির ওপর দিয়ে ঘোড়াগুলো ছুটে গেল
হৃদয়ভূমির ওপর দিয়ে ঘোড়াগুলো ছুটে গেল
শস্য, হৃদয় ও ভূমি তছনছ, বিনষ্ট, ছারখার।
স্বপ্ন আর সাহসের নিঃসঙ্গ পাথর মূর্তি
তোমাদের স্থিরতায় অস্থিরতা কেন?
পাথর মূর্তির দেহে দাউ দাউ আগুন নাকি?
টগবগে ফুটন্ত নাকি কলকাতার রক্ত!
হাতের রক্তের দাগ মুছবে না
সাত সমুদ্রের নীল জলও।

ঘোড়াগুলো বিশ্বস্ত বেগবান হিংস্র এবং মরিয়া
প্রত্নগুহার প্রাচীন শীতল অন্ধকার থেকে
পায়ে পায়ে অন্ধকার উড়িয়ে
ঘোড়াগুলো ছুটে এলো
কেন এই ধাবমান পশুশক্তি, ঘোড়ার তরঙ্গ
এই সব ঘোড়াদের পূর্বপুরুষরা তৈমুরের নাদিরের বাহন ছিল
তৈমুরের নাদিরের বংশধররা এই সব ঘোড়ার পিঠে এখন।

ভালোবাসার বুকে ঘোড়ার পায়ের খুর
সাহসের বুকে কেটে বসা দাগ
চেতনার গায়ে জ্বালাধরা আগুন।
কাঁদানে ধোঁয়ার অন্ধকারের মধ্যে
ভালোবাসা, সাহস আর চেতনা এখন
বেগবান হিংস্র এবং মরিয়া ঘোড়াগুলোর মুখোমুখি।

সময় বরণ

মুক্তধারা কোন পাথরে
বজ্রবাঁশি কোন মেঘে বা
আগুন-লাগা অন্ধকারে
শীতল নদী প্রবাহিত।

বৃক্ষ জ্বলে বসন্তে যে
চোখের মণি নির্ঝরিণী
মৃত্যু থেকে প্রত্যহকে
ভিন্ন করা যায় না তবু।

রাত্রিদিনই সময় বরণ
সময় বরণ বিসর্জনও
রক্তমাখা শূন্যতা যে
প্রবল ঢেউ-এ আন্দোলিত

মুক্তধারা কোন পাথরে
বজ্রবাঁশি কোন মেঘে বা
আগুন-লাগা অন্ধকারে
শীতল নদী প্রবাহিত।

কেউ ধানদূর্বা দিয়েছিল

আমার মাথায় কেউ ধানদূর্বা দিয়েছিল একদিন
সিঁদুরলেপা কুলো ঠেকিয়েছিল আমার কপালে
শঙ্খের শব্দ থেমে যাওয়ার পর
পায়ের কাছ থেকে ছায়া সরে গেল।
ছায়ার ভেতরের সেই সুশীতল উৎসব
পুড়ে যাওয়ার পর
এখন ঘর-পোড়া দিনগুলোর চোখে শুধু ভয়।
হৃদয়ের সেই জায়গাগুলো এখন শস্যহীন।
আড়ালের অন্ধকারে তুষের আগুনের মতো
পুড়ে-যাওয়া তাপ।
বাজপড়া গাছের দিকে তাকিয়ে
আমাদের স্নায়ুর মধ্যে একটা শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়।
আমরা যেন সময় ছাড়িয়ে এক সময়হীনতার দিকে হাঁটি
যেখানে মাঠের বুকে সোনার ধান ও সবুজ দূর্বা ছিল একদিন।

আমার মাথায় কেউ ধানদূর্বা দিয়েছিল একদিন
সিঁদুরলেপা কুলো ঠেকিয়েছিল আমার কপালে।

সময়তর্পণ

সময়ের কূলে কূলে কয়েকটি প্রতিবিম্ব যেন ভাসমান
আঁধার উজ্জ্বল হও, এই লগ্ন আলোকিত কর।
শূন্যতা সজ্জিত কর দেবদারু পাতায়।
অগ্নিময় জল ঠাণ্ডা, কেননা সে প্রতিবিম্ব।
নিরুত্তাপ নিমগ্ন ভূমিতে
ধীরে ধীরে নেমে যাও অতি নিম্নে মজ্জার খনিতে
রক্তস্রোত আলোড়িত কর।
বুঝলে হে বুকের বোঝা, একটু ঘুমাও
তা না হলে সারাদিন, তা না হলে সারারাত
সারারাত সারাদিন
নড়বড়ে নকল মেকি, ঘোলাটে ঘায়ের মতো
ভেতরে ভেতরে সব গভীর গড়বড়।

আমরা এত প্রতারিত কেন?
আমরা যেন এক দৈর্ঘ্যে সব এঁটে গেছি
বড় ভয়ানক সব মুখের চেহারা
কোনো স্বাদ উপাদেয় নয়
আসলে সমুদ্র দেখে ভীষণ বিষণ্ণ লাগে
বরঞ্চ পাহাড় রমণীয়।
কোথাও ছায়ার শব্দ নেই
হাত দিয়ে ধরে না কেউ শাখা
এমন নিভৃতি নেই
যেখানে উজ্জ্বল উলঙ্গ হওয়া যায়।
আমরা এক রক্তময় যন্ত্রণার তীরে
সময় তর্পণ করি।
সময় তর্পণ করি।

বর্ষায়

বর্ষা তো যায় যায়, তবু বৃষ্টির কামাই নেই
যখন তখন আসে, ভিজে ঢোল রাস্তাঘাট কাদা
মেজাজ তিরিক্ষি তেতো। দিনকাল যে পাল্টে যাচ্ছে দাদা
দেখবেন এবার হয়তো শীত পড়বে একেবারে সেই
চৈত্রে কি ফাল্গুনে। তাছাড়া কলকাতা ভয়ানক অল্পে খুশী
তিনঘটি জলেই ডোবে। বর্ষাটা দু'চোখের বিষ
মরুক গে গোল্লায় যাক। এখন বয়েস কতো? চল্লিশ টল্লিশ?

ছাতায় মানবে না ওহে, ছাতাগুলো ভয়ানক বাজে
গরম বুকের রক্ত, বাহাদুরি অনেক দেখালে
বর্ষা তো যায় না, বৃষ্টি নাছোড়বান্দা যে
কাশি, হাঁচি, জ্বরো, জ্বরো। হাঁপানিটা হালে।

থই থই বৃষ্টির জল একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে মাঠে
কয়েকটি দুরন্ত ছেলে সারাদিন ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা জলে প ডুবিয়ে হাঁটে

তুমি দেখেছিলে

তুমি দেখেছিলে নদীতে নৌকোর চোখে জল।
তারপর দিন ছাড়িয়ে রাত্রির বাতাস
আর নোঙর ফেলার শব্দ।
বন্দরের রাস্তার দুদিকে একপায়ে দাঁড়িয়ে
আলোর পঙক্তি।

আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকালাম
তারপর আমাদের ছায়ার দিকে
তারপর দূরের দিকে
সেখানে একটা একা, ঘোড়াটা, অন্ধকারের বিমূর্ত ছবি,
যেন শেষ আরোহীর ভাবনায় মগ্ন।
আমরা গাড়ি আর জন্তুর পাশ দিয়ে
সেই কফিখানার আড্ডার দিকে গেলাম
যেখানে কেন্দ্রহীন টেবিলের চারপাশে অনেক মুখ
আর দেয়ালের গায়ে একটা বড় কাচের খাঁচায়
ঈশ্বরের সমান বয়সী এক আশ্চর্য পাখি।

যাত্রী নিবাসের দরজা কখন বন্ধ হয়!
সেই দিকে হেঁটে যেতে যেতে
দু একটা স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের চোখে পড়ল।
এবং আমরা খুব কাছে থেকেই যেন
নিপীড়নের নিঃশব্দ শুনলাম।
তারপর মৃত্যুর নীরক্ত দাগগুলোর ওপর
আমাদের হাতের স্পর্শ রেখে
হেঁটে যেতে যেতে উপলব্ধি হল
সেই আলোকিত বধ্যভূমিতে আমরা
যেখানে আমাদের অনেক প্রিয় ধারণা ও অনুভবের

মৃত্যু ঘটে গেছে।
যেন আরেক গলগথা।

মনে হল তোমার শরীর যেন ভাঙা বাড়ি
গাছের বউলও ঝরে গেছে
বধ্যভূমির দিকে যাওয়ার সময়
মৃত ঘনিষ্ঠ অনুভবের কথা ভেবে
আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে
তোমার চোখে কী যেন দেখলাম
নদীতে নৌকোর চোখে জল।

রাস্তার দুদিকে আলোর পঙক্তি
তখনও একপায়ে দাঁড়িয়ে।
আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকালাম
তারপর আমাদের ছায়ার দিকে।
আমরা হেঁটে হেঁটে সেইদিকে গেলাম
যেখানে একটা এক্কা, ঘোড়াটা অন্ধকারের বিমূর্ত ছবি।

দশবিশ বছর পরে

এসব কবিতা খুলে কারা পড়বে দশবিশ বছর পরে ?
মানব প্রকৃতি খুবই সাময়িকভাবে তরঙ্গিত ইদানীং
আসলে প্রকৃতিগত প্রজন্মের ব্যবধান। পাল্টায় সময়, কবিতাপাঠক, সমঝদার।
শহর, রেস্তোঁরা, রাস্তা ঘাট। সকলেই পরিবৃত হতে চায়
সম্মেলনে পাঠে, মগ্ন থাকতে চায় নানান তারিফে।
তারা হয়তো আন্তরিক ভাবে সৎ। ভীষণ টগবগে
কিংবা পোড় খাওয়া, ঝানু, শিল্পবোধের ব্যাপারে অভিজ্ঞ জহুরী
হয়তো খুবই পরিচিত মহল্লায়, মফঃস্বলে
পাণ্ডববর্জিত গ্রামে, হয়তো খুবই আলোড়িত ঝড়ে।

এই সব আয়োজন, আলোকিত অন্ধকার
ভীষণ গোলমাল। মাইক বাজে, সারারাত শীত।
নির্লোম ছায়ার মতো অগোচর সবই
স্নায়ুর প্রকৃতি জেনে কেউ কথা বলে
হরেক রকম সাজ, মুখোশ ও অহঙ্কার শব্দের ভিতরে।

কোদাল কোপানো মাটি মনে হয়
আকাশের চাকাচাকা মেঘ।
আয়নার মতন কেউ একা হয়ে যায়
চোখের দেয়ালে কার ছবি ?
আমাদের ঘরের উঠোন নেই
কারা দূর অন্তরাল দিয়ে হেঁটে যায়
কাঠের পুতুলগুলো হাত পা নাড়ে, হাসে
বিকেলের কাক
দিনের পাঁচিলে বসে ডাকে।

তারপর বেলুনওলা আসে।
হাওয়া ভর্তি লাল নীল সবুজ বেলুন
একটা দুটো তিনটে বেলুন হাতে
তিনটে দুটো একটা বেলুন হাতে
কোনদিকে বেলুনওলা যায়
পাখি মেঘ অন্ধকারে শিশুদের স্বপ্নের ভিতরে।

জেগে আছি

শীতল চন্দন মাটি লেপে দাও সাময়িক দেহে
কেননা আগুন খুব প্রতিকূলভাবে সব পোড়ে
কে জুড়োতে পারে জ্বালা?   শীতলতা আছে নাকি স্নেহে
পাথরে মণ্ডিত মাটি।   কি নিখুঁত স্থাপত্য শহরে।

হয়তো এ-দাহ তাপ গ'লেগ'লে নির্ঝরিণী হবে
জলের তরল রুপো অফুরন্ত প্রবাহের খনি
তোমার গহন মুখ দেখব বলে শ্মশানে উৎসবে
আমি এই নরকের অন্ধকারে জেগে আছি সমস্ত রজনী।

বিদেশী কবিতা অবলম্বনে

টেরি বাগিয়ে জোয়ান পা ফেলে
হাঁটছি যেন হাওয়ার বাঁকে বাঁকে
যে মেয়েরা জানে আমায় তাদের বন্ধু বলে
তারা কিন্তু পক্ককেশ বুড়ো বলেই ডাকে।

এবং যে-সব তরুণ বন্ধু চলতে ফিরতে দেখা
তাদের ব্যাপার সহজ নয় গল্পে
যখন আমি যা-ই বলি একা
পাকা চুলের কথা তারা তুলবেই তুলবে।

আমরা তবু হাত দিয়েছি অনেক শক্ত কাজে
বছরগুলো কেটে যাবে, তারপর শুনবই
তিরিশ বছর বয়সে আমার চুলে পাক ধরেছে
ষাট বছরে পৌঁছে তবু বুড়ো হলাম কৈ ?

হাজার পায়ে

ভাই-এর হাতে গুলতি
খুঁজে বেড়াচ্ছে পাখি
ছায়ার মতো ফুলদি
উড়াল দিল কী ?

শালিকগুলো ঝগড়াটে
চড়ুইগুলো চালাক
ধরা যায় না একটাকে
কৈ রে টিয়ার ঝাঁক !

চন্দনা নেই তল্লাটে
দুধেও নেই সর
হাজার পায়ে কেন্নো হাঁটে
কলকাতা শহর ।

হেঁটে যাই

শব্দরেখা ধরে আমি হেঁটে যাই দূরে
চতুর্দিকে পাথরের স্মৃতিস্তম্ভগুলি
শীতল, প্রাচীন, ভগ্ন। গহ্বরের চতুর্দিক ঘুরে
পার হই দূরচিহ্ন, নিবন্ত গোধূলি।

নিকটে সময় শব্দ, কবরের আলোকিত মালা
মেঘের গম্বুজগুলো স্থাপিত বিষাদ
আহত বিনষ্ট বক্ষ, বন্ধদ্বারে তালা
বৃক্ষ তলে মৃত পাখি, অন্ধকার নিষাদের হাত।

সে রক্তবিন্দুর কণা আমার রক্তেও মিশে আছে
দিনের হলুদ রৌদ্রে ডানা মেলে কাঁপে
শিকড়ে, পল্লবে, ডালে, পত্রময় গাছে
টান লাগে ধমনীতে, সত্তায় স্বভাবে।

পরভূমি

নিকটে শীতল নদী
জলস্রোত ছিল

আমার চেতন ভোর
রৌদ্র আহরণে গেছে
চোখে বাঁধে নদীর কুয়াশা।

আমি যাবো
জন্মভূমির দিকে যাবো
জন্ম নিতে যাবো
আমার দ্বিতীয় জন্ম
আমার আরেক জন্ম।

মাঠের ধান ও দূর্বা
মাঠের বাতাস
অন্ধকার সন্ধ্যার পাহাড়
মিলিত মৌলিক যোগ
ব্যবধান
সমন্বয়
এ বাতাবরণ
কোনদিকে আমার জন্মভূমি !

একটি সবুজ গাভী
দেহময় সাদা গাঢ় বিন্দু বিন্দু মিষ্টি উষ্ণ দুধ
কান্নার অতীত প্রান্তে
শীতের জ্যোৎস্নার দিকে হেঁটে চলে গেছে।

এ পরবাসে—এইখানে
জন্মভূমি থেকে এত দূরে
খুঁজে পাবে নাকি সেই মায়া বৃক্ষ
বৃক্ষের হৃদয় !

এই পরভূমি ছেড়ে
আমি যাবো
জন্মভূমির দিকে যাবো।

আমরা দেখি

আমরা যেন সাময়িকভাবে তৃষ্ণাকে মেটাতে চাই
খুবই কাছে আগুনের সিঁড়ি।
অনেক শীতল শব্দ পাথরের মতো যেন
আমরাই তো পুড়ি স্বাভাবিকভাবে সে-আগুনে।
ছিঁড়ে যায় যোগসূত্র, সব পরম্পরা
সময় ছিন্নতা জুড়তে কেউ কেউ মন দেয় তবু
ক্রমাগত সময়ের বারান্দায় শরণার্থী জমে
কিছুই হয়নি বলে গান গাওয়া তবু
সবই ঠিক আছে—এমন রঙের ছবি আঁকা
আর নিজেই নিজেকে ডেকে নিঃসঙ্গ বিদায়
অথচ একটি আধারে সবই থাকে, জলের প্রতিমা থাকে
আমরা দেখি আগুনের সিঁড়ি
আমরাই তো পুড়ি
স্বাভাবিকভাবে সে আগুনে।

দূর মঞ্চ

কেউ কেউ দূর মঞ্চে চলে গেল
দূর মঞ্চ আলোকিত নয়।

স্মৃতিশক্তি যাদের প্রখর খুব
তারা শুধু বিচলিতভাবে
দুঃখকে সাজায়।
অনেকেই ভুলে থাকতে চায়
মুখের আদল নাম ঘটনা ইত্যাদি।
অনেকেই নেশা করে সেই জন্য
নেশা মানে নিজের সত্তাকে
প্রেমে, দেশপ্রেমে, শিল্পে নিয়োজিত করা।
এদিকে তো সব কিছু এলোমেলো, উল্টোপাল্টা
ইতিমধ্যে হাতছাড়া অনেক সম্বল, স্বপ্ন
তবু কোনো অমোঘ প্রকৃতি
নদীকে গভীর করে, বৃক্ষ ফলবতী হয়
সেই জলে আমাদের তৃষ্ণা মেটে
সেই ফলে ক্ষুধা
এই নদীবৃক্ষ তো পাথর নয়
পৃথিবীর আদিম দেবতা।

আছে

বুকের ভিতরে বৃক্ষ জলধারা আছে
আছে রক্ত চন্দনের গন্ধ, পড়ে জল, ঝরে পাতা
মাটির দেয়াল ঠাণ্ডা ছায়া ঘিরে আছে
উঠোনের শীতল পাটি পাতা।

সে আছে চোখের মধ্যে রক্তে নির্ঝরিণী
আছে রোদে স্রোতে তরঙ্গে ছায়ায় প্রতিদিন
সে আছে মেঘের মধ্যে ক্ষিপ্র অগ্নিময়
বিদ্যুতের সোনার হরিণ।

শৈশব দূর্বায় ঘাসে পাতায় শৈবালে কালো জলে
এবং বৈশাখ রোদে তৃষ্ণার কলস জলে ভরে
অভিন্ন অজস্র ধারা, দুরন্ত দূর্বার স্রোত বয়
একই বৃক্ষ বুকের ভিতরে।

এমন দেখেছি

আমি এমন নারী দেখেছি
দুধের বাচ্চা কোলে
অথচ তার স্তন নেই।

আমি এমন শিশু দেখেছি
যার মাথার চুল
দুধের মতো সাদা।

আমি এমন যুবক দেখেছি
যার পা গুলো
ঠিক হাতের মতো।

আমি এমন অনেক মানুষ দেখেছি
যাদের সারা গায়ে
শুধু সাদা সাদা উইপোকা।

সেই মূর্তি

এই জন্মভূমি, এদেশ প্রতিমা
যেন এক অমোঘ ভঙ্গীতে কিছু চায়।
আমাদের হৃদয়হীনতা তবু
রাত্রিদিন প্রতিযোগিতায় মাতে
আমরা যেন সহজ প্রথায়
ভিতরের ভয়ঙ্কর শব্দগুলো শুনি।
সবই যেন স্বাভাবিক স্রোত
দেখেও দেখি না আমরা
সেই মূর্তি, তার নগ্ন ভয়াবহ রূপ।

ফিরতে হয়

ছুটি ছাটায় কলকাতায় থাকার কোনো
মানে হয় না
যে-কোন জায়গাই কলকাতার চেয়ে ভালো
পুজোয় এবার পাহাড়ে নাকি সাগরে
নাকি বাংলাদেশ, ঢাকা !

অথচ এসব দুচারদিনই ভালো
তার বেশী নয়।
চিরদিনই কলকাতায় মানুষ
ইস্কুলে কি কলেজে
তারপর তো কাজে।
এই শহরের সঙ্গে যেন বাঁধা পড়ে আছে
স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন—সব কিছু।
সবাই মিলে নতুন রাস্তা খুঁজে খুঁজে হেঁটে
মিলেছি অনেকদিন ময়দানে, ব্রিগেডে
ধর্মঘটে, কলকাতা-কাঁপানো শব্দে শ্লোগানে মিছিলে
তবু যেন দু'পশলা বৃষ্টিতে ভেজা কলকাতার
পথঘাট অন্ধকার নরক দর্শন সেরে
কাদা পায়ে ভেজা গায়ে জল পার হয়ে
বাড়ীর দরজায় ফিরে অথবা না ফিরে
কলকাতার হাত থেকে বাঁচার জন্যই
পাহাড়ে নাকি সাগরে
নাকি বাংলাদেশ, ঢাকা।

দূরে গেলে তবু টানে
শিকড়ের মূল ধরে টানে
কলকাতাই টানে।

এই শহরের রাস্তায় গলিতে
অনেক ঠিকানা আছে।
অনেক গানের দলে, পদ্যের আসরে
নাটকের মহড়ায় কি ছবি আঁকার ঘরে
আমাদেরই আপনজন আছে
তখন আবার ফিরতে হয় কলকাতার কাছে।

বয়েস

এই বয়েসটা যেন আমাকে ঠিক মানায় না
মাঝে মাঝে মনে হয়
এটা যেন আমার বয়েসই নয়।
আমার চেয়ে অনেক লম্বা চওড়া
অন্য কারো ঢলঢলে জামার মতো
অন্য কারো বয়েস নিয়ে
আমি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বয়েসটা যেন আমাকে ছাড়িয়ে
আমার আগে আগে চলেছে
এবং আমাদের মধ্যে
বিস্তর ব্যবধান।

রাস্তায় কোনো বান্ধবীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে
তার সঙ্গে দুটো কথা বলার ইচ্ছা আমার হতে পারে।
ইস্কুলের পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে পেট ভরে আড্ডা দেওয়ার দুরন্ত বাসনা
আমাকে চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে যেতে পারে
মিছিল দেখে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে
সকলের সঙ্গে পা মেলানোর দুর্বার টানে
আমার পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু ওই ব্যস্তবাগীশকে এসব কে বোঝাবে ?
আর যে বুঝেও না বোঝার ভাণ করে
তাকে আমি ভয় দেখিয়ে বলি :
আগে গেলে বাঘে খায়
পিছে গেলে সোনা পায়।

এ আর চলবে না

লণ্ঠন সারাতে গিয়ে বাতিওলা বলেছিল
বাতিটা চলবে না বেশীদিন
ফুটোয় ফুটোয় ঝাঁজরা তেলের জায়গাটা
আরেকটা লণ্ঠন কিনে নিন।
বাতিওলা অভিজ্ঞ ঝালার কাজে, জানে
ব্যবস্থা পুরনো হলে পাল্টাতেই হয়
এদিকে বিদ্যুৎ বন্ধ ঘর অন্ধকার
মা বলেন. কি হল রে, এ তো দেখছি ফিরে এল পুরোনো সময়।
আর কতদিন চলবে এই দশা, এই অন্ধকার
কারা এই অন্ধকার দিনে দিনে বাড়িয়ে চলেছে
তাদেরই কি আধিপত্য সবার ওপর !
রাস্তায় রাস্তায় যারা বাতি জ্বালে তারা সব কোথায় উধাও
চোর খুনী ডাকাতরা প্রভুত্ব ফলায়
মা বলেন, এ আর চলবে না বাপু
তাহলে কি হবে।
খোল নলচে সবশুদ্ধ পাল্টাতেই হবে।

শবযাত্রী

আমি তোমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো।
কমপক্ষে আটদশ বছর
আমি তোমাদের চেয়ে মৃত্যুর নিকটে বেশী
শীতল সহিষ্ণু বেশী
পুরাতন বেশী।
তখন সময় স্বপ্ন অন্যরূপ ছিল
তার জন্য মায়া
ভোরের মুখের ছবি অন্যরূপ ছিল
জলহাওয়া উত্তাপ আলোকবিন্দু
অন্যরূপ ছিল।
পাহাড়ের অস্থিরতা ছিল
স্থিরতার প্রবল দুরন্তপনা ছিল
তার ধৌত বর্ণ ছিল
হৃদয় স্পন্দন ছিল।

নৌকো ভেসে গেছে দূরে
মগ্ন নীল উচ্চতার পতনের পর
অবস্থানগুলো সব পাল্টে গেছে।
পাহাড়ের চূড়া ভাঙা
গাছের শিকড় কাটা
মঞ্চে এক ভয়ঙ্কর পাপ পরিণতির সম্মুখে
আমরা সব অদিপাউসের চোঁখ যেন।
টুকরো টুকরো পাথরের নিষ্প্রাণতা আমাদের চোখে
পুরাতন বিশ্বাসের বাসা আর নেই
আর কোনো বাসা বানানোর দিকে মানুষের গভীর সংশয়
ভয়ানক অন্ধকারে যে-যেখানে পারে
আছে, থাকবে। একা বা দলবেঁধে, দূরে

শব্দহীন শোকে, রক্তে, প্রভূত বমনে
নিঃসঙ্গ নরকে, তবু নৃত্যপরায়ণ
বিকৃত মুখের ছবি, ক্ষুধায় ক্ষরণে
নিষ্ফল কামজ কর্মে নিরন্তর
নিজেকে খামচিয়ে কুরে খাবে।

এই পথে কতদূর যাবে ?
এখন সময় বড় সাংঘাতিক
সময়ের গলিত উদরে ঢুকে ডুবে থাকবে
কৃমিকীটে যকৃত প্লীহায়
অন্ধতম অন্ধকারে
গর্ভের পচনশীল বিনষ্ট বীজের গন্ধে, জলে।
এই খানে পথ নিয়ে এলো।
এখানেই প্রান্ত নাকি ? শেষ নাকি ?
এ প্রান্তরে ঈশ্বর নারী ও কাক খেলা করে
বাঘিনীরা স্তনমালা আন্দোলিত করে।

কে টানে
কোথায় টানে
স্রোত টানে
স্মৃতি টানে
বৃক্ষের স্থিরতা টানে
নদী টানে
প্রতিবিম্ব টানে
কোথায় নদীর মুখ
বৃক্ষের শিকড় !
হৃদয়ে শিকড় নেই জেনে
নিয়ত তাড়িত তবু আত্মায় কি নিয়ে
সমস্ত প্রহার নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে

স্বপ্নের শিথিল শব কাঁধে নিয়ে
শবযাত্রী শবযাত্রী হাঁটি
হৃদয়ের শব্দ থেমে গেছে
হৃদয়ের শব্দ থেমে গেছে
হৃদয়ের শব্দ থেমে গেছে
শব্দ এক ধাবমান অগ্নিময় শূন্যময় বোধ

কাঁপায় সমস্ত মূলগত

আমাদের সংজ্ঞাহীন প্রতিকৃতি স্বাভাবিক, খুবই পরিচিত
তৃষ্ণায় কারো যদি বুক ফাটে—জল নেই, হাওয়া দুর্বিষহ
কি দিয়ে আবহমান আমাদের এ-পুরোনো প্রতিমা নির্মিত
কোন উপাদানে গড়া হয়েছিল এই সব প্রাচীন বিগ্রহ
ভীষণ পতন শব্দ চতুর্দিকে, চতুর্দিক ভগ্ন ও বিক্ষত
মুণ্ডহীন, চক্ষুহীন হস্তপদ, হৃদয়বিহীন অভিনয়
শুধু এক অস্থিরতা বয়ে যায়, কাঁপায় সমস্ত মূলগত
নিয়ন আলোয় মগ্ন কতিপয় অন্ধ যেন বাইজী নাচায়।

রক্তের ভিতরে ক্রুদ্ধ পশু শুধু আর্তনাদ করে
সমস্ত আকাশ জ্বলে আদিগন্ত চিতার আগুনে
অসংখ্য শেয়াল ডাকে সময়ের বিস্তীর্ণ কবরে
সূর্যাস্তের রঙ যেন দুর্বিষহ দুঃসংবাদ আনে।

আমাদের সংজ্ঞাহীন প্রতিকৃতি স্বাভাবিক, খুবই পরিচিত
কি দিয়ে আবহমান আমাদের এ প্রাচীন বিগ্রহ নির্মিত!

তবু টানে

ঘরবাড়ীর দরজাগুলো সব বন্ধ
থিয়েটারের সীনে-আঁকা ঘরবাড়ীর মতো
যেন কেউ কোথাও ছিল না
যেন কেউ কোথাও নেই
যেন থেকেও নেই
অথবা না-থেকেও আছে ।

নিঃসঙ্গ পাহাড় জ্বলে, বালুময় চতুর্দিক জ্বলে
মুহূর্ত রক্তাক্ত হয়, চুরমার মূর্তির মুখ
অন্ধকারই সময়ের রঙ
সংবাদ নিহত হওয়া, কিংবা কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি ।

অথচ কি পরিপাটি করে সাজানো গোছানো ঘর
মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই কিছু
অথচ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার অন্তরালে ।

কথা ও কাজের মধ্যে ছায়া দীর্ঘ হল
বিশ্বাস ও ব্যবহারে ব্যবধান অসেতুসম্ভব ।
উপলব্ধি, তোমার সঞ্চয়গুলো দেখো ।

আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীগুলোর মধ্যে ঘুরঘুর করছে একটা নিঃসঙ্গ বেড়াল
দরজার মুখে লোহার শেকলে বাঁধা বাঘা কুকুর
আর রঙ করা সুখের খাঁচায় বন্দী সবুজ চন্দনা ।

শহরের চাতালে মাংসপিণ্ডের গজানো হাত পা
হৃৎপিণ্ড মুখে করে অসংখ্য আকারহীন মুখ
আর মরা গিরগিটির তেল, শেয়ালের চোখ
ভালুকের অস্থিমালা ও চামড়ার দুর্গন্ধ

কচ্ছপের গায়ের পুরু পিচ্ছিল
ঘন শ্যাওলার মতো অন্ধকার
আর বুকের তৃষ্ণা মেটাতে বৃষ্টি
রক্ত বৃষ্টি।

আমার সামনে একটা পাথরের বা ব্রোঞ্জের
বা পোড়ামাটির বা অন্য কোনো ধাতুর
মূর্তির ভাঙা ভাঙা টুকরোগুলো।
আমার পায়ের নীচে ফলবান এক শীতল বৃক্ষের
উপড়ানো শিকড় আর দগ্ধ শাখার
জ্বলন্ত অঙ্গারগুলো।

জেগে আছ হে
পাথর
জায়গা আছে হে
সমুদ্র।

এক পা এক পা করে কোনদিকে যাচ্ছ
ছুটে ছুটে ছুটে কোনদিকে যাচ্ছ
হামাগুড়ি দিয়ে কোনদিকে যাচ্ছ।

অথচ আমি বৃক্ষ রোপণ করেছিলাম
মাটির নীচে আমার স্নায়ুর শিকড় নামিয়েছিলাম
আলো বাতাসে ছায়ায় আর বৃষ্টির জলে
আমি ভরে উঠতে চেয়েছিলাম।

ঢেউ

কোনো কোনো চিন্তা যেন ভীষণ নাছোড়বান্দা
কিছুতেই ছাড়ানো যায় না পিছু নেওয়া
অথচ শব্দের সিঁড়ি ভেঙে
আমরা কোন জায়গায় পৌঁছুতে চাই
শব্দময়তার উৎসব প্রাঙ্গণে, নাকি
শব্দহীনতার কক্ষের দরজার কাছে।
অনেক কথার ফলা বুকে বিঁধে আছে
অনেক কথার ভার বয়ে বয়ে পেশীতে যন্ত্রণা
অনেক কথার রক্তে ভিজে গেছে সমস্ত শরীর
পুড়ে গেছে হাত পা মুখ কথার আগুনে।
আমাদের চতুর্দিকে দৃশ্যগুলি হননের যন্ত্রণার আগুনে ঝলসানো
দেখি মৃতদেহ, মৃতকল্প মুখ, খোবলানো চোখের মণি
শিশুর, নারীর কিংবা পুরুষের নিঃসঙ্গ নিহত ছায়া
আমাদের মুখময় কথার বুদ্বুদ, ফেনা, থুথু, লালা
অথচ কখনো যদি নির্মম বল্লমে বিদ্ধ হয়ে
প্রকৃত রক্তের মতো কথা ঝরে
সেই কথা অগ্নি হয়, বৃষ্টি হয়
উচ্চারণে আমাদের সত্তায় ছড়ায়
রোমাঞ্চ, স্পন্দন এক প্রবাহের অনুভব, ঢেউ।

কিভাবে দেখব

আমরা এই সময়কে কিভাবে গ্রহণ করব
খুব রাগীভাবে নাকি একটুও মাথা না ঘামিয়ে।
কোনোদিকে মেঘের ভীষণ ডাক নেই
বাঘের প্রচণ্ড রাগ নেই
চতুর্দিকে নিয়মিত দৈহিক ব্যায়াম শুধু
কে বলবে যে ভয়ানক অন্ধকার বিদ্যুৎসঙ্কট
মাইক বাজে সারা রাত ধরে, বেজে যায়
বাতি জ্বলে দিনের বেলায়ও, জ্বলে যায়
এবং অনেক কিছু পুরোনো সম্বল
যা না-হলে একদণ্ড চলবে না মনে হত
পুড়ে ছাই হয়।
সাজানো চিতাই জ্বলে যেনবা শহরে, গ্রামে, সারা দেশে
অথচ সমুদ্র কেন লক্ষ চোখ মেলে দেখে
এ সমুদ্রে ঢেউ নেই, ক্রোধ নেই, আগুনের জিভ নেই।
মনে হয় সবই যেন উল্টোপাল্টা
ছবিগুলো কি জীবন্ত হৃদয়হীনতা
মাইকের সামনে বসে কারা শুধু রেকর্ড পাল্টায়
লাল নাল আলোর বাহারে গাতে
এসব কিসের ছবি ? দেশ, পরদেশ নাকি
অন্য কোনো নাম আছে এর।
অথচ শুনিতো
মানুষের হৃৎপিণ্ড পাল্টায়
কলকাতার হাসপাতালে সুদক্ষ ডাক্তার।

গাছটা

কয়েকটা লাল নীল সাদা ঘুড়ি লুটে
গাছটা ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়েছিল ।
আকাশের দিকে মুখকরা একদল একরোখা ছেলে
একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল ।
তারপর ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিনটাকে তাড়িয়ে দিয়ে
আকাশে তারা ফোটাতে ফোটাতে যে যার দিকে চলে গেল ।
তখন মনে হল রাত্রি আরো একাকী হলে
ঘুড়িগুলো আকাশের দিকে উড়ে যাবে ।
কিন্তু না, এসব কিছুই হল না ।
পরদিন দেখা গেল গাছটা একটা দোকান হয়ে গেছে
একটা ঘুড়ির দোকান ।

আমাদের চতুর্দিক

অনেকেরই ঘরে রাখা আছে
অলীক রাঙতায় মোড়া স্মৃতির অ্যালবাম।
মাঝে মাঝে ঘর অন্ধকার করে দেখা
সেই সব মুখের ছবি।
এবং জ্বলন্ত রেখা ভীষণ সাপের মতো
জড়িয়ে রয়েছে এই সত্তার হলুদ গাছ।
অথচ বৃষ্টিও নেই, চতুর্দিকে শুধু
মরুমণ্ডলের তাপ
অগ্নিময় অস্থিরতা শুধু।

আমাদের চতুর্দিকে সময়ের কালো রক্ত, পচা নাড়িভুঁড়ি
নিহত পশুর লোম ছাল চামড়া হাড়।
হাইড্রেন্টে পা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে মুণ্ডহীন ধড়
রাস্তাঘাট, গলিঘুঁজি খুবই অন্ধকার ; কাঠ পাথর কাচ
খোঁজে কার হৃৎপিণ্ড, ঈশ্বরের বাসস্থান, রাত্রির শ্মশান
চতুর্দিকে দূষিত দুর্গন্ধ জল
ভেসে যায় বিষ্ঠা ও গলিত শিশু
প্রতিমা, ঢাকের শব্দ, ভাসানের কোলাহল
আর মরা কাক
উলঙ্গ হিজরের নাচ নিয়মিতভাবে
আমাদের চতুর্দিক আলোকিত রাখে।

উদ্বেল হয়

আলোড়িত নীল সমুদ্র কেন নোনা
তৃষ্ণার জলবিন্দু কোথায় আছে
অন্ধকারে কি রাত্রির ঢেউ গোনা
দূর দিগন্ত কবে যে আসবে কাছে !

শুধু ফুল দিয়ে সজ্জিত শবাধার
ঋণ মুক্তির সকল প্রয়াস বৃথা
চতুর্দিকেই অসঙ্গতির ভার
মাঝে মাঝে শুধু উদ্বেল হয় স্মৃতি !

দীর্ঘপথের দুদিকে পাথর ফলক
বধ্যভূমির চারিদিকে বড় শোভা
মাটিতে ছড়ানো শুভ্র পাখির পালক
এবং হৃদয় অন্ধ বধির বোবা ।

সময় শিশির ফোঁটা ফোঁটা শুধু ঝরে
নিভৃত নদীর বালুতে কাদের ছায়া
গভীর জলের শরীর জুড়ানো স্বরে
তবু কেন মায়া, তবু কেন এই মায়া ।

একটা খবরের জন্য

একটা খবরের জন্য সকলেরই চোখে মুখে উৎকণ্ঠা
স্কুটার চেপে যে লোকটা এলো
সে কিছুই বলতে পারল না।
যেতে যেতে সে হাতের এমন একটা ভঙ্গী করল
যেন কিছুই করার নেই
অনেকক্ষণ বাদে বাসের মাথায় চেপে
কিছু লোক এলো
তারা বলল যে ব্যাপারটা তারা চোখে দেখে নি
তবে লোকের মুখে শুনেছে।
আর তারা যেতে না যেতেই
একটা ছেলে তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে
রিক্সা থেকে নামতে নামতে বলল
যা মনে হয়েছিল ঘটনাটা আসলে তা নয়
এবং সেই সময় একটু দূরে দেখা গেল
অনেক লোক পায়ে হেঁটে আসছে।
তারা বলল – ব্যাপারটা খুব সাংঘাতিক
কি হবে কিছুই বলা যায় না।
আর ঠিক সেই সময় একটি মেয়ে
পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে এসে বলল :
ভেতরের অন্ধকারের মুখটা খুলে দিতে না পারলে
কাউকেই বাঁচানো যাবে না।

ঠিকানা

আমার বুক পকেটে একটা ঠিকানা

সমস্ত ইতিহাসটা তো জানাই আছে
রাস্তাঘাট নখদর্পণে
এবং একদিকের তাপ
আরেকদিকের পাথর গলিয়ে
স্ফটিক জল করে।

আমরা একটা দিনের চড়াই ভাঙি
দুঃস্বপ্নের মধ্যে রাত্রিগুলো গাভিন হয়
হিমঘরের অন্ধকার আমাদের চারদিকে দেওয়াল তোলে।

ওদিকে দর্জির দোকানে বুকের মাপ নেওয়া হচ্ছে।
হিসেবের খাতায় সংখ্যাগুলো কালো কালো পোকার মতো
ব্যাঙ্কে অনেক তাজা রক্ত জমা হচ্ছে।
একটা পাখি দুটো ডানা দিয়ে সময় মাপছে
অসুখের দোকানে
রক্ত আর চোখের জল পরীক্ষা করা হচ্ছে

আমার বুকপকেটে একটা ঠিকানা
আমরা একটার পর একটা দিনের চড়াই ভাঙি
একটা পাখি দুটো ডানা মেলে সময় মাপছে
দুঃস্বপ্নের মধ্যে রাত্রিগুলো যেন গাভিন হয়।
হিমঘরের অন্ধকার আমাদের চারদিকে দেয়াল তোলে
একদিকের তাপ আরেকদিকের পাথর গলিয়ে
স্ফটিক জল করে।

শিকড় ছিঁড়ে

ঘরের দেয়ালের ছায়া আর টান
পেছনে পড়ে থাকল।
বালুর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে
বালুতে পা ডুবিয়ে
মেয়েটি গাছের মতো হয়ে গেল।
তারপর ছুটতে ছুটতে, ছুটতে ছুটতে
সমুদ্রের অদ্ভুত নীল আকাঙ্ক্ষার ফেনার মধ্যে
আছড়ে পড়ে
ভীষণ আবেগে আন্দোলিত মুহূর্তগুলোকে
শরীরের অভ্যন্তরে নিয়ে
পুরুষ ঢেউএর সঙ্গে সঙ্গমের চূড়ায় উঠে
অতল অন্ধকারে নেমে
সেই সাদা রুপোর বালুর ওপর
উৎক্ষিপ্ত সমর্পিত সেই মেয়েটি
অফুরন্ত নীল উত্তাল সেই তরঙ্গমূর্তির পায়ের কাছে
একটা শীতল সামুদ্রিক মাছের মতো শুয়ে থাকল।

জোনাকি

হিজল বনের জোনাকি
তোর হাতেই বোনা কি
অন্ধকারের চাদরটা
ছিঁড়ছে বসে বাঁদরটা।

হিজল বনের জোনাকি
এখন তবে করা কি
চাদর হল ছিন্ন
নেই বাঁদরের চিহ্ন।

বৃদ্ধ ধীবরের প্রতীক্ষায়

চতুর্দিক পড়ন্ত নীলাভ
আকাশ মেঘ, বালুরাশি, জলরাশি।
কাঁধের পেশীতে দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে
জেলেরা তাদের নিরেট নৌকোগুলো
বালুর ওপর দিয়ে সমুদ্রের দিকে নিয়ে গেল
সমুদ্রের জলে ভাসাল।
তারপর নীল সময়ের ভিতর দিয়ে মাছ ধরতে ধরতে
তারা একটা পাহাড়ের দিকে চলে গেল
যেখানে সবুজ শ্যাওলায়
আশ্চর্য মাছের ঝাঁক খেলা করে।
আর এই সব দেখতে দেখতে
আমি সেই বৃদ্ধ ধীবরের প্রতীক্ষায় থাকি
যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সিংহের স্বপ্ন দেখে
আর একটা অতিকায় মাছের অস্থি
নৌকোয় নিয়ে ফিরে আসে।

এই সব ফুল খেলা সার্কাস ছাড়িয়ে

রোদে পুড়ে জলে ভিজে যেতে হয় অনেক জায়গায়
বেগবান টায়ারে চাকায় সময়ই যেন বা ঘোরে
দুপুরে ছুটির দিনে ইঁট পেতে রাস্তায় ক্রিকেট জমে
এবং রাত্তিরে আলোকিত ব্যাডমিন্টন খেলা।
কোথাও বা মাঠের মাঝখানে সার্কাসের তাঁবু পড়ে
শীতকালটা কলকাতায় ফুলের বাহার।

এই সব ফুল খেলা সার্কাস ছাড়িয়ে এক অন্ধকারে
দুঃস্বপ্নের হাসপাতালে শুয়ে আছে
হাত-পা-ভাঙা অদ্ভুত সময়।
তারই পাশে নিঃসীম কয়েদখানা, বধ্যভূমি
শৃঙ্খলিত আগুনরা যেখানে, নিবে আসে, জ্বলে
আর আলোকিত উন্মাদ আশ্রমে
অনেক স্বপ্নের ছবি, বহু মূর্তি, স্নায়ুর জটিল রেখা
টুঁটি খাওয়া, ভাঙা চোরা, ছড়ানো ছিটোনো সব।

জানে না

একটি যুবক তার ফুটোকরা বুক আর
বিচ্ছিন্ন উদর নিয়ে শুয়েছিল রাস্তার ধারেই।
রক্তে মাখামাখি জামা, নীল চুল, বুকের কিশোর লোম
হাত পা ঠাণ্ডা শীতল বরফ।
একপাটি স্যাণ্ডেল নিয়ে দুটো কুকুরের খেলা
অশথের ডালে বসে দেখেছিল তিনটে শকুন
মাটি শুষে নিয়েছিল রক্ত ঠিক ব্লটিং-এর মতো।

আশেপাশে ঘর বাড়ি বারান্দা জানালা দরজা সব বন্ধ
হয়তো গভীর রাত্রে বন্ধ থাকে বারান্দা জানালা দরজা অন্ধকারে
হয়তো গভীর রাত্রে সকলে নিদ্রিত থাকে অন্ধকারে একমনে
হয়তো জাগ্রত কেউ শুনেছিল সাময়িক বুকের স্পন্দনে
অথবা শোনেনি কারো
রক্তপতনের ধ্বনি অন্ধকারে।
সে সময়ে সঙ্গমের চূড়ায় আরোহী কেউ অন্ধকারে
জানে না যে কোনোখানে ক্রোধের অরণ্য রয়ে গেছে
জানে না যে প্রতিহিংসাপরায়ণ রত্নাকর সমুদ্র উত্তাল হয়ে আছে
জানে না যে পাথরে পাথরে মরীয়া আগুন জেগে আছে।

তোমার মুখের কাছে এখন কিসের পাত্র

তোমার মুখের কাছে এখন কিসের পাত্র, দূরে তারামালা
বৈদ্যুতিক অন্ধকারে মগ্ন হয় চতুর্দিক, চতুর্দিকে রোগ
সবই ঘোর অন্ধকার—তাঁবু, পার্ক, বোণ্ডেল, তিলজলা
রাস্তার জটিল মোড়ে কারা যেন রেখে গেল রক্তাক্ত পোশাক।

সময় আহত ছিন্ন—রক্তস্রোত কোনদিকে টানে
উদ্যমের হাত পা বাঁধা ভয়ঙ্কর কয়েদখানায়
আততায়ী ছায়া ঘোরে, উঠে যায় অভীষ্ট সোপানে
অগণিত মৃতদেহ প্রত্যহ শহরে জন্ম নেয়।

কবরের পাশে এক ফুলের বাগান
মালী ও মালিনী চায় পল্লবিত শাখা
অন্তরালে অবিরাম প্রতিমা ভাসান
ঘরের দরজার কাছে কার মুখ —ঠাণ্ডা, রক্তমাখা।

দুদিকে নকল সৌধ, সিঁড়ি, লন লোকায়ত বীমা
বিকল চাকার শব্দ ফুচকা কোকাকোলা
তালতলা, গালিফস্ট্রীট সংঘর্ষশব্দিত মৃত্যুসীমা
ট্রেনেকাটা ভোরবেলা, নিরুদ্দেশ বিকেল হরবোলা।

ফিরে এসে

চাকা খোলা লরিটা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে।

রাস্তার অনেক জায়গা খোঁড়া
অনেক জায়গায় খানা খন্দ জল
কোথাও বা ডাঁই করা পাথর কুচি
বাড়ি বানানোর মালমশলা
আর বাতাসে পীচপোড়া গন্ধ।
রাস্তা সমান করার রোলারটা
পালোয়ানের মতো এক পাশে দাঁড়িয়ে।

লরির ওপর সাজানো মালপত্তর
তেরপল দিয়ে ঢাকা,
যেন আচ্ছাদিত রহস্যময় মৃতদেহ।

কিছুক্ষণ বাদে ওরা লরির তলা থেকে উঠে এলো
তারপর চাকার খোঁজে শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।
চাকা নিয়ে রাত্রির ভেতর দিয়ে ওরা যখন ফিরছে
আকাশে তখন সোনা গলানো চাঁদ
চাকাটাকে রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আনার সময়
ওরা একবার চাঁদের দিকে তাকাল
একবার চাকার দিকে।
তারপর সেই জায়গায় পৌঁছে দেখল—লরিটা নেই
সেখানে রাস্তা সমান করার রোলারটা
পালোয়ানের মতো দাঁড়িয়ে।

চিঠি

এই জংধরা পুরোনো বাক্সটা
টান মেরে উল্টে ফেলে দিলে
ভেতরের সবকিছু মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে।
ভাঁজকরা পুরোনো কাপড় চোপড় জামা
অনেকদিনের পুরোনো রুমাল
পোকায় খাওয়া শাল
আর খুব চেনা একটা পুরোনো গন্ধ
আর ন্যাপথলিনের গন্ধ।
জামাকাপড়ের নিচে
একেবারে তলায় পাতা
পুরোনো খবরের কাগজের নিচে
একটা বিবর্ণ হলুদ চিঠি :
তার অক্ষরগুলো এতো অস্পষ্ট যে
ঠিক বোঝা যায় না।
মাঝে মাঝে দু একটা কথা
আন্দাজ করে নেওয়া যায় শুধু।
যেমন মাতৃভূমি কথাটা
এবং মৃত্যু
অথবা স্বপ্ন বা ভালোবাসা
এই কথা।

দেখতে পাই

কোন কোন দেয়ালের দিকে তাকালে
আমি কতগুলো দুর্বোধ্য হরফ দেখতে পাই
অথবা দরজার গায়ে দেখি
কোন নিঃসঙ্গ নারীর বিমূর্ত শরীর
কিংবা কোন পুরুষের উলঙ্গ মৃতদেহ
অথবা কোন ভীষণ দুর্ঘটনার রক্তাক্ত ছবি।

মেলা

সটান দাঁড়িয়ে ওঠে কোন কোন আবেগের দেহ
হয়তো এখন এক আপেক্ষিক পর্যায়ের দিকে যাওয়া
চাষীরা তো দলবেঁধে জমির দখল নেবে
মানব জমিনে তাই রোপনের এই তো সময়।
চেতনার চূড়া তবু সোনার মুকুট পরে না তো
যেন ধারাবাহিকতা নেই কথায় ও কাজে।

আমরা এক সময়ের দিকে চলি সকল সময় যাত্রী
যেদিকে এ-পদযাত্রা সেদিকে কি আমাদের হৃদয়যাত্রাও
তবু এক ব্যবধান থাকে মনে হয়
মনে হয় হৃদয়ভূমির দিক ছেড়ে কোথায় চলেছে
দুই জমিনের চাষী এক হলে সেই ক্ষেত্রে মেলা হয়
তাই আমরা পথ হাঁটি সে মেলার দিকে।

প্রতিবিম্ব

করতলে কার মুখ ?
সে মুখমণ্ডল
আচ্ছন্ন, আবৃত করে
তার
প্রতিবিম্ব নেই।

আমার ছায়ার সঙ্গে
আমি হাঁটি
রৌদ্রে অন্ধকারে

আচ্ছন্ন আবৃত এক প্রতিবিম্ব একা।

দু একটা পাথর

দু একটা পাথর তবু
কিছুতেই ভাঙা যায় না
তাকে নিয়ে আমাদের অন্ধকার কাটে
আগুনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলে
সে-পাথর আমাদের জল দেয়
কনকনে শীতের রাত্তে
তাকে নিয়ে গোল হয়ে আগুন পোহানো যায়।
তার কোনো ভয়ঙ্কর আকর্ষণ আছে
আমাদের স্বপ্ন চিন্তা ভালবাসা যেন
গচ্ছিত রয়েছে তার কাছে।

তীরভূমি

সারাদিন সাড়া শব্দ স্রোত নিয়ে থাকা
চতুর্দিকে ভয়ানক পড়ি মরি দৌড়
ছায়া জল হাওয়া চেয়ে দাঁড়াই যদিবা
মেঘ দেখে কিছুতেই নাচবে না ময়ূর।

প্রবাহিত জলধারা পাথরের নিচে যেন চাপা
রাত্রিদিন কুয়াশায় আচ্ছাদিত হয়
দু একটা নৌকোর আলো দূরে দূরে কাঁপে
অন্ধকার তীরভূমি প্রহেলিকাময়।

মাটি জল গাছপালা নির্জনতা পায়
রহস্য ঘনায় বুকে, তোলপাড় ঢেউ
ঝাউবনের দিকে নেমে কারা যেন জল থেকে ওঠায়
ভাসমান মৃতদেহ। জলে ডুবে মরেছিল কেউ।

এই খেলা

এখন তো শুধু দূরবীন দিয়ে দেখা
অন্ধকারেই টর্চের আলো ফেলা
সারাদিনমান ভিড়ের মধ্যে একা
সারাদিনমান এই খেলা, এই খেলা।

রোদের আকাশে রঙের বেলুন ওড়ে
নীল প্রজাপতি রক্তের লাল ফুলে
বিধুর দিনের ঘনিষ্ঠতার স্বরে
বন্ধুকে পাই সাদা ছোপধরা চুলে

তবু কোনোখানে মায়া রেখে যায় স্মৃতি
রাস্তায় ট্রামে দেখা হলে কখনো বা
ঢেউ এর মাথায় উচ্ছল হয় নদী
বুকের মধ্যে তোলপাড় করে কিবা!

জলের মধ্যে

জলের মধ্যে জল ছাড়া আর
কী আছে বা
বুকের মধ্যে কী আছে তা
তুই দেখে যা।

সময় আছে, সময় ছাড়া
আর কিছু না
তাকে নিয়ে কী করি যে
তা জানি না।

থাকার মধ্যে না থাকাটা
একরকমের পাথর
সেটাই যেন আগাগোড়া
আচ্ছাদনের চাদর।